‘যার জন্য যা, তাতেই খেল তা’

ছোটবেলায় সন্ধ্যাতারা মিটিমিটি জ্বলার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা ক’ভাইবোন পাড়ার খেলার সাথীদের নিয়ে বিশাল উঠোনের মাঝখানে পাটি বিছিয়ে ধাঁধার আসরে বসতাম। সময়টা কিভাবে যেন পার হয়ে যেত। ধাঁধাগুলোও ছিল হালকা প্রকৃতির। বড় হয়ে এখন বুঝি কত হালকা জিনিস নিয়েই না সময় পার করেছি! আমাদের আসরে মাঝে-মধ্যে এসে যোগ দিতেন আমাদের থেকে বয়সে একটু বড় কেউ। একবার এসে একজন একটা প্রশ্ন করল, “বলো তো, ‘যার জন্য যা, তাতেই খেল তা’ ধাঁধার অর্থ কী?” আমরা ঘাবড়িয়ে গেলাম। অনেক বছর ধরে মাথার মধ্যে ধাঁধাটা মাঝে-মধ্যে ঘুরপাক খেত। পরে বাস্তবতার ঘা খেয়ে দিনে দিনে বুঝতে শিখেছিলাম। কারণ ধাঁধাটা এ দেশের, আমার জীবনটাও অতিবাহিত করে চলেছি এ দেশেই। উত্তরটা তাকে আর বলা হয়ে ওঠেনি। বুঝতে শিখেছি নানা রূপে, নানান ভঙ্গিতে, ভিন্নভাবে জীবনের প্রতিটা পদে পদে তার প্রয়োগ দেখে। বুঝেছিলাম, যে ছাগলের মাংসকে রসনা তৃপ্তির জন্য রান্না করে খেতে বাজার থেকে শুকনো মরিচ, মসলা, তেজপাতা কিনে এনে রান্নঘরে রাখা হয়েছিল, অর্থাৎ নিজের জন্য যত আয়োজন, কোনো এক সুযোগে সেই ছাগলই রান্নঘরে ঢুকে মসলাপাতি খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। তাই এখন আর কর্ম দেখে ঘাবড়িয়ে যাইনে, অলক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে হাসি। সে হাসি ম্লান হয়ে যায় নিমিষেই। ভাবি, কেন এমন হলো? ভাবনার মধ্যে কি কোনো গলদ ছিল? দেশ স্বাধীন হয়েছিল তিনটি লক্ষ্য সামনে নিয়ে– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। রাজনীতিবিদরা দেশের জন্য এ আয়োজন সাজিয়েছিলেন। এতটা বছরে কেন এর একটিও অর্জন করতে পারলাম না? কেন আমরা বারবার ভূতের মতো পিছনে হাঁটছি? এর পরিণতি কী?

আজ সকালে উঠেই পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম আর অন্যমনস্ক হয়ে রকমারি সংবাদের মধ্যে শুধু নেগেটিভ সংবাদগুলো গুনছিলাম। দেখলাম, শতকরা পঞ্চাশভাগের বেশি সংবাদই নেগেটিভ; সংবাদগুলো আমাদের সমাজব্যবস্থা ও মানুষের নেগেটিভ দিকের কর্ম ও এর বহিঃপ্রকাশ। কোনোটা মানুষের প্রকৃতিগতভাবে নেগেটিভ, কোনোটা সামাজিকভাবে নেগেটিভ, কোনোটা আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে নেগেটিভ, কোনোটা পরিবেশের জন্য নেগেটিভ। সবকিছু সমাজের মানুষই করছে, ভাবছে। তারা এই সমাজেরই লোক। আমরা জনগোষ্ঠীকে নষ্ট করে ফেলেছি। নষ্ট চরিত্রের লোকজন সমাজের পরতে পরতে সমাজ-পরিচালক হিসেবে বহাল তবিয়তে আসর জমিয়েছে। সকল নেগেটিভ প্রভাব এদেশের উপর চেপে বসেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ হলে হয়তো বলে বসতেন, ‘দেশকে শনির দশায় ধরেছে’। এসব কথা শুনে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ‘আপনার চোখে শুধু নেগেটিভ বিষয়গুলো ধরা পড়ে কেন? আপনি কি তাহলে নৈরাশ্যবাদী?’ আমি নৈরাশ্যবাদী হতে চাইনে, পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা আমাকে ক্রমেই নৈরাশ্যবাদিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অতি উৎসাহী কেউ বলতে পারেন, ‘দীর্ঘ একান্ন বছর ধরে আমরা এত এত যে দেশের উন্নতি করলাম, পত্রিকাগুলো ইচ্ছে করেই শুধু নেগেটিভ সংবাদগুলো প্রকাশ করে, এটা সংবাদপত্রের স্বভাব।’ আমি এ কথাতে সবিনয়ে শুধু বলি, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ছাপতে গেলে সমাজে যা ঘটে তাই তো প্রকাশ করতে হয়। নেগেটিভ ঘটনা অবিরাম ঘটতে থাকলে পত্রিকাগুলোই-বা ভালো-পজিটিভ সংবাদ পাবেটা কোথায়? খারাপ ঘটনা ঘটলে তাকে কত ভালো করেইবা আর লেখা যায়! সমাজের একজন মানুষ যখনই কোনো কিছু ভাবে ও তা প্রকাশ করে এবং সে-মতো কাজ করে, তখনই তার ভেতরটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সংবাদের নামে আমরা সমাজের পরিবেশ, মানুষের মন-মানসিকতা ও কর্মকে জানি। একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি দেয়াশলাই বাক্সের সান্নিধ্যে ঘর্ষণ দিলে আগুন জ্বলে ওঠে। কেউ দেখে, কাঠিটা জ্বলে উঠলো। আমরা বলতে পারি, কাঠিটা শুধু জ্বললোই না, কাঠি ও বাক্সের অন্তর্নিবিষ্ট স্বভাব প্রকাশ পেল।

এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও সমাজব্যবস্থায় যেদিকে তাকায় অগণিত নেগেটিভ সংবাদ, হতাশার দিগন্তরেখা, দুরাশার ছায়াবৃত্ত, সর্বগ্রাসী অব্যবস্থাপনা, মানবতার অপমান, মনুষ্যত্বের বিকৃতি সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছে, চারদিক থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কোনো আশার আলো দেখিনে, তাই নৈরাশ্যবাদিতায় ভুগি। এসব কোনো এক বছরের কর্মফল নয়; সুদীর্ঘ একান্ন বছরের আবাদী ফসল। মূলত মানুষ তার ঐচিত্যবোধ ও মনুষ্যত্ব ক্রমশই হারাচ্ছে। এর দায় থেকে

কেউই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারিনে। সবকিছুই আমাদের সামগ্রিক ব্যর্থতা; সুশিক্ষার অভাব, দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ঘাটতি। সমস্ত নেগেটিভ ঘটনাই প্রমাণ করে আমাদের মানবিক গুণাবলীর অবক্ষয়। আমরা যে যেখানেই বাস করি না কেন– আমরা এদেশের একই সমাজে বাস করি। তাই মানবিক গুণাবলীর এ অবক্ষয় আমাদের পুরো সামাজের অবক্ষয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে শিখেছি বটে। কিন্তু এ অবক্ষয়কে কোনোক্রমেই অস্বীকার করতে পারিনে। এ অবক্ষয় এতই প্রকট যে, আমরা নিজের অপকর্ম ও অপচিন্তাকে নিজে উপলব্ধি করতেও অক্ষম ও অপারগ। অর্থাৎ অপকর্ম ও অপচিন্তা করতে করতে আমরা এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যে, নিজের চিন্তাধারার মধ্যে এই অপচিন্তা ও অপকর্মকেও অবলীলায় উৎকৃষ্ট চিন্তা-চেতনা বলতে ও ভাবতে লজ্জাবোধ ও দ্বিধাবোধ করিনে বরং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসর মাত করি। নিজের কৃতিত্ব বলে জাহির করি। আত্মজিজ্ঞাসার জায়গাটা ফাঁকা রয়ে যায়। এ আমাদের ভালো ও মন্দকে পৃথক করতে না পারার অক্ষমতা; বোধহীনতাও বলা যায়।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উপর সব দোষ চাপিয়ে আমরা আমাদের অপচিন্তা ও অপকর্ম ঢাকতাম। পাকিস্তান শাসনামলে পশ্চিমা সামরিক শাসকগোষ্ঠীর উপর সব দায়ভার চাপিয়ে আমরা ভালোমানুষ সেজেছি। অনেক দায়ের সাথে শোষণের দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে, এটা সত্য, আমরা মেনেও নিয়েছি। কিন্তু আমাদের এ সামাজিক ও মনুষ্যত্ববোধের অবক্ষয় আমাদেরই। আমরা কোনো অন্যায়কে নিজের স্বার্থে মনগড়া ন্যায় বলে ভাবতে শিখেছি– এর থেকে নৈতিক অবক্ষয় আর কী হতে পারে! এ অবক্ষয় এই একান্ন বছরে দিনে দিনে প্রকটভাবে পরিস্ফুট হচ্ছে। এর জন্য অন্য কোনো বহিঃশক্তিকে দোষারোপ করলেও কেউ তা গ্রহণ করবে না। আমরা কর্মদায় গ্রহণে বড্ড পিচ্ছিল স্বভাবের। নব্বই দশকের প্রারম্ভে এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী আখ্যায়িত করে তার পতনের পর অনেক বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক কলাম-লেখক এদেশে এখন থেকে গণতন্ত্রের বন্যা বয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। আমি অলক্ষ্যে মুচকী হাসতাম আবার আশাবাদীও হতাম। অলক্ষ্যে মুচকী হাসতাম এই ভেবে যে, সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয় দূর করবো না, বসবাসরত মানুষের ও সমাজ পরিচালকদের মানসিকতার পরিবর্তন করবো না, মনুষ্যত্ববোধের উন্নতি ঘটানোর কোনো শিক্ষা দেবো না, শুধু আন্দোলন করেই দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবো ও গণতন্ত্র চর্চা করবো, 'চাটার দল'কে মানুষ বানিয়ে ফেলবো– তা কীভাবে সম্ভব! 'বিড়াল বলে খাবো না মাছ, ছোঁবো না আমি কাশিতে যাবো' অবস্থা। এসব ভাবনা আমাকে মুচকী হাসতে বাধ্য করতো। আজকের এই দিনে এসে এখন আমরা দেখছি, আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই পড়ে আছি। বরং মানবিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা ও নৈতিকতার অধঃপতন; দেশপ্রেম, দুর্নীতি, ক্ষমতাধর কারো পিঠ চুলকিয়ে দিয়ে আত্মস্বার্থ হাসিল, দলবাজী ইত্যাদি বিবেচনায় আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি।

এদেশের মানুষ আমাদের মূল উপজীব্য। মানুষের জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র। এদেশ শান্তিতে বসবাসের উপযোগী কী-না সেটাই আমরা সর্বাগ্রে বিবেচনা করবো। এদেশের গণমানুষের মুক্তির জন্য যত আয়োজন, এই সমাজের একশ্রেণির ক্ষমতাসন্ধানী ও স্বার্থবাদী লোকজন বা গোষ্ঠী তা সমূলে নিপাত করে চলেছে। এই শ্রেণি রাজনীতিসহ প্রতিটা পেশাতেই স্বচ্ছন্দে আছে। রাজনীতি এখন আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। প্রতিটা পেশারই সুযোগসন্ধানী চাটুকার লুটেরাগোষ্ঠী ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতির ধামাধরা হয়ে বসে আছে। নিজের পেশাকে কলঙ্কিত করে, জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজনীতির মই বেয়ে নিজের জীবনের উন্নতি করছে। এদের দুর্নিবার কর্মকাণ্ড বরং অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদদের মাথায়ও 'দেশসেবা', 'জনসেবা' কথাগুলো হালকা-পানসে হয়ে গেছে। তারা এখন 'হেথা নয়, অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে' রসাস্বাদনে ব্যস্ত। সামনে নির্বাচনের পদশব্দ কানে ভেসে আসছে। সেখানে হয়তো 'পদপ্রার্থীতা' কেনা-বেচার বাজার আবার বসতে পারে। 'দেশসেবা', 'জনসেবা' শব্দযুগল এখন পণ্য হিসেবে কেনা-বেচার সংবাদ হয়তো অমূলক কিছু নয়। আমরা দু-চোখ জুড়িয়ে দেখার প্রতীক্ষায়। এদিকে সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রে ভেজালের সমারোহ। খাবারে ভেজাল, পণ্যে ভেজাল, লেনদেনে ভেজাল, নির্মাণে ভেজাল, কথায় ভেজাল, মূল্যে ভেজাল, অর্থবাজারে ভেজাল, ধর্মে ভেজাল, কর্মে ভেজাল, আচরণে ভেজাল, কোথায় ভেজাল নেই! সমাজে চলে-বলে-খেয়ে শান্তি উঠে গেছে। কেন? সমাজের মানুষের মানসিকতার বিকৃতি ঘটেছে বলে। মানুষ গড়ার দিকে গুরুত্ব

না দিয়ে, মনুষ্যত্ববোধের উন্নতি না করে যে কোনো অপকৌশলে পাহাড় পরিমাণ টাকা গড়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছি বলে। 'বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি' বলে। মানুষের দুর্নীতিপরায়ণতা, শঠতা, প্রতারণা, অনভিপ্রেত চাটুকারিতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যার বেসাতি, বলদর্পিত দাপট বেড়েছে, তাই। অমানুষসুলভ কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছি, তাই। সুশিক্ষা নেই, আইনের শাসন নেই, মনুষ্যত্ববোধের চর্চা নেই, সমাজে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন লোকের মাঙ্গলিক পদচারণা ও কর্ম নেই, তাই।

আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে বলেই আমাদের নাম মানুষ হয়েছে। আমরা মানুষের মতো কর্ম করবো না অথচ নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবো, এটা কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ। মানুষের মধ্যে পশুত্বের প্রাবল্য বেশি দেখা দিলে তখন আমরা আর মানুষ থাকিনে, সে-মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করি। সরাসরি পশু বলতে দ্বিধা করি, তাই। বনের পশু আমাদের মতো এত জটিল-কুটিল সমীকরণ কষতে অপারগ, এটা আমাদের কৃতিত্ব। আমাদের অনেক পশুসুলভ কর্মকাণ্ড আমাদেরকে নরাধম বানিয়েছে। অথচ মানুষই মানুষের জন্য দেশ গড়ে, সমাজ গড়ে। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষের জন্যই সব। সমাজে কুশিক্ষিত ও দুরাচারের প্রাধান্য বেশি হলে সামাজিক অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়। অশান্তি বিরাজ করে, উৎকৃষ্টতা লোপ পায়। সমাজের চেহারা দেখেই মানুষের প্রকৃতি চেনা যায়। যে সমাজে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানেরা সমাজের প্রধান আসনগুলো দখল করে রাখে, সমাজে সম্মান পায়, সে সমাজ পচে নষ্ট হয়ে গেছে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়। যে সমাজে অশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ, মিথ্যাবাদী, সোস্যাল টাউট, মিথ্যার দাপট বেশি, সমাজ এদের পক্ষাবলম্বন করে, সমাজে এদের কদর বেশি– বুঝতে হবে সে-সমাজে বুনো আবহ বিরাজ করছে, সমাজের বিবেক ধ্বংস হয়ে গেছে, সমাজে সুশিক্ষিত লোক তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে, সমাজে তখন আর আইনের শাসন নেই, মিথ্যাবাদী ও প্রতারক তার বলদর্পিত দাপটে আসন গেড়ে বসেছে। সে সমাজের অন্য সব সাধারণ মানুষ হয় নির্বোধ, নইলে অসহায়। যে মানুষের জন্য এত আয়োজন, সেই মানুষের একটা বলদর্পী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অনেক ত্যাগে গড়া শান্তির আবাদি ফসল লুটেপুটে শেষ করে দিচ্ছে, সমাজে খবরদারি করছে, সমাজের রক্ষক বনে গেছে। আমরা এ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি।

এজন্য মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ দরকার। মনুষ্যত্ববোধ মানে মানুষ হওয়ার, মানুষের মতো কর্ম করার ও মানুষের মতো ভাবার হাতেখড়ি। মানবিকতা, সুশিক্ষা, বিবেক, নৈতিকতা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসচেতনতা, সম্মানবোধ প্রভৃতি মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। এগুলো যাদের মধ্যে আছে তারাই মানুষ। এজন্য সমাজে মনুষ্যত্ববোধসম্পন্ন মানুষ তৈরিতে, শিক্ষিত সমাজ গড়তে সুশিক্ষিত লোকের এগিয়ে আসা সময়ের প্রয়োজন। বিড়ালের মুখ-ভেংচিতে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সুশিক্ষিত লোকদের আগল ভেঙে সমাজে জায়গা করে নিতে হবে। সমাজে সুশিক্ষার রীতি চালু করতে হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নইলে তিমিরাচ্ছন্ন জীবন যুগ যুগ ধরেই চলতে থাকবে। এই মানুষই সুশিক্ষা পেলে, সুশিক্ষিত হলে ভালো ও উন্নত দেশ ও সমাজ গড়ে। তখন সমাজে মানুষের বসবাস সুখ-শান্তিতে ভরে যায়।

(২৮ মার্চ ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।